● দৈনিক
আজকের কাগজ

তারিখ ... 23 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন

আনু মুহাম্মদ

এক

গত বছরের ২২ ডিসেম্বর, এরশাদ [এক] পতনের ১৭ দিন পর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপর ইসলামী ছাত্র শিবিরের যে হামলা সংঘটিত হয় তারপর থেকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। দীর্ঘদিন অগণতান্ত্রিক ভেতর-বাইরের চাপের মধ্যে থাকার পর এরশাদ পতনের মাধ্যমে পরিবর্তনের একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা বুঝেই উঠতে পারেননি। অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট শক্তিসমূহের নগ্ন চেহারা সেখানে বরঞ্চ এরপর আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। "সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা" যেভাবে গণরায়কে শৃঙ্খলিত করেছে, সামরিক বেসামরিক গণশত্রুদের নিরাপত্তা দিয়েছে, সেভাবে নিরপেক্ষতার নামে এসব অপশক্তিকেও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে।

এরকম "নিরপেক্ষতার" আরেকটি নজির স্থাপিত হয়েছে ২২ ডিসেম্বরের সেই ঘটনার তদন্ত করবার জন্য যে এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়েছিল তার রিপোর্টের মাধ্যমে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই কমিটির আংশিক রিপোর্ট (১) ২২ ডিসেম্বরের হামলা ও ছাত্রমৈত্রী নেতার হত্যাকান্ডের দায়িত্ব থেকে ছাত্র শিবিরকে রাক্ষা করা (২) এই ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করা (৩) একাংশ শিক্ষকদের অভিযুক্ত করা এবং (৪) বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনকে সবকিছুর গোড়া বলে অভিযুক্ত করবার সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনকে অভিযুক্ত করবার চেষ্টা কিংবা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের সঙ্গে শিক্ষকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারকে যুক্ত করবার চেষ্টা আজকের নয়, বহুদিনের। বিশেষতঃ এরশাদের সামরিক শাসন আমলে এই চেষ্টা অনেক গুণে বেড়েছিল। ক্রমান্বয়ে এটা একটি প্রচারণায় পরিণত হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় অশান্তির মূল। এই প্রচারণাটি শাসক শ্রেণীর মধ্যে খুব জনপ্রিয় এবং তারা সুযোগ পেলেই তাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। উল্লেখ্য যে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকও বিশেষতঃ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত প্রাক্তন উপাচার্য কিংবা সিনিয়র কিছু শিক্ষকও এর উৎসাহী সমর্থক।

আপাতঃদৃষ্টিতে এর সপক্ষে বিভিন্ন ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য করে সাজানোর কোন অসুবিধা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন আসার পূর্ব পর্যন্ত উপাচার্য চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। উপাচার্য আবার ডীন বিভাগীয় প্রধানদের নিয়োগ দান করতেন। অর্থাৎ এসব পদের জন্য কাউকে ব্যাপক শিক্ষকদের দ্বারস্থ হতে হতো না, উর্ধতন একজন ব্যক্তিকে খুশি রাখলেই চলতো।

কিন্তু দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পর ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন চালু হবার পর এ নিয়ম বদলে যায়। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আইনে চালু হয় (এখনও সবকয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আইন চালু হয়নি) সেখানে শিক্ষক, রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট এবং সরকারী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সিনেট উপাচার্য পদের জন্য তিনজনকে নির্বাচিত করেন। চ্যান্সেলর তাদের মধ্যে থেকে একজনকে নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন অনুষদের ডীন নির্বাচিত হন এবং বিভাগীয় সভাপতি সিনিয়রিটি অনুযায়ী একের পর এক তিনবছর মেয়াদে (সহকারী অধ্যাপক পর্যন্ত) নিযুক্তি পেতে থাকেন। সিন্ডিকেটের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রতিনিধিরা সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত হন, তাঁরা ছাড়াও সিন্ডিকেটে থাকেন সরকারী বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালক প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষক প্রতিনিধি সরাসরি শিক্ষকদের ভোটে নির্বাচিত হন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের সভাপতি এবং অধ্যাপক পদাধিকার বলে এর সদস্য। এছাড়াও সরকারী ক'জন ব্যক্তিও পদাধিকার বলে এর সদস্য। অর্থ কমিটির একটি বড় অংশও নির্বাচিত।

অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন চালু হবার পর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাদের উপরই ন্যস্ত।

এই ব্যবস্থাধীনে উপাচার্য, ডীন এবং সিন্ডিকেট সদস্য হবার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের নির্বাচকমন্ডলীর কাছে যেতে হয়। তাদের ভোট কার পক্ষে যাবে, কে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন এনিয়ে খুব সঙ্গত কারণেই শিক্ষকদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি বা বহুধাবিভক্তি সৃষ্টি হয়। এর কারণে সৃষ্টি হয় শিক্ষকদের গ্রুপ। এই শিক্ষকদের গ্রুপকে সাধারণভাবে শিক্ষক রাজনীতি বলা হয়, বলা হয় দলাদলি। রাজনীতি যদি যথাযথ অর্থে ধরা হয় তাহলে এই গ্রুপ বিভক্তির মধ্যে রাজনীতি খুব কমই কাজ করে। যেকারণে একই গ্রুপে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামাত এমনকি 'উদারনৈতিক' বামপন্থীদের সমবেত হতে দেখা যায়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য পরিস্থিতির কারণে গ্রুপবিভক্তি একটি স্পষ্ট আদর্শিক রূপ নিয়েছে এমনও দেখা গেছে।

এটা ঠিক যে, এ ব্যবস্থা এখনও গণতান্ত্রিক একটি উন্নত পরিবেশ পুরোপুরি ধারণ করতে পারেনি। এ ব্যবস্থার বিকাশ বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থার মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা আমরা লক্ষ্য করি। যেহেতু উপাচার্য তার নির্বাচিত হবার জন্য প্রভাবশালী শিক্ষক গ্রুপের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল এবং পুনরায় নির্বাচিত হবার শখ তাদের অধিকাংশেরই থাকে বলে এই নির্ভরশীলতা থেকে যায়, সেকারণে তারা সে গ্রুপের নেতৃত্বের একটি অখন্ড অংশে পরিণত হন। ঐ গ্রুপ নেতৃত্বের বিরাগভাজন কোন শিক্ষক একারণে তার প্রাপ্য নানারকম অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন, পদোন্নতির ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে, ছুটি, হলের চাকুরী (শিক্ষকদের স্বল্প আয় থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবাসিক সুবিধাযুক্ত এ চাকুরীকে মূলের মত ব্যবহার করে থাকেন) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বঞ্চিত হতে পারেন তিনি। মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী শিক্ষক কোন গ্রুপের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সুবিধা বিতরণ করে দলভারী করবার চেষ্টা করতে পারেন, নানারকম ঝামেলা সৃষ্টি করেও অনেককে কাবু করতে চেষ্টাও করতে পারেন। পরস্পর বদনাম, রেষারেষি, ল্যাঙ মারা, কাদা ছোঁড়াছুড়ি ইত্যাদিও হতে পারে। ক্লাশ বা অন্যান্য দায়িত্ব পালন না করলেও ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার কারণে অনেকে অনেক সুবিধা পেতে পারেন। আবার অনেকে এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেও ক্ষমতার বিরাগভাজন হবার কারণে অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে পারে। গ্রুপভারী করবার জন্য শিক্ষক নিয়োগের চাইতে একটি ভোট নিয়োগের চেষ্টাও হয়। আর এসব কদর্য কার্যক্রমে উপাচার্যেরও ভূমিকা থাকতে পারে যদি তিনি পুনরায় নির্বাচিত হবার জন্য খুব আগ্রহী থাকেন। পুনরায় নির্বাচিত হবার জন্য আগ্রহী হলে উপাচার্যকে একই সঙ্গে ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গেও ভাল